Vol. 11 | No. 1 | 1967

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্র-সাহিত্যে রহস্যবাদ

Volume	11
Issue	1
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	June 15, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i1.1
Pages	1-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
একাদশ ব
বর্ষা : ১৩৭৪
Check for updates

রবীন্দ্র-সাহিত্যে রহস্যবাদ

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সমাজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আধ্যাত্মিক শব্দের শাস্ত্রসংগত ঠিক অর্থটি কী তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আত্মা সম্বন্ধীয়'। কোনো খণ্ডকালে বা খণ্ডদেশে যাহার অবসান নাই এমন যে এক অজর অমর সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান, তাহা সহজবোধ্য হউক বা দুর্বোধ্যই হউক, তৎসম্বন্ধীয় যে-ভাব তাহাকে আধ্যাত্মিক ভাব বলে।" আবার 'ভাষা ও সাহিত্যে' উল্লিখিত হইয়াছে, "মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব -- আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা ও মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।" তেমনিভাবে তাঁহার 'কালান্তরে' পাই: "আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে—সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা।"

যেমন তিনি আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ আত্মার ব্যাখ্যাও তাঁহার গ্রন্থাদিতে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'কর্তব্যনীতি' প্রবন্ধে আছে, "হিন্দুশাস্ত্রমতে পরিবর্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্য সত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্তী সেই নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম এবং

জীবের অন্তরস্থিত ধ্রুবসত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধি বাসনা প্রভৃতি মায়াদ্বারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়াকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া থাকে।" আবার, তাঁহার পিতাকে উৎসর্গীকৃত 'আলোচনা'-গ্রন্থে একটি প্রবন্ধের নামই রহিয়াছে 'আত্মা'। সেখানে আত্মার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, "আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার রহিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে। ···সুতরাং, আত্মাকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি স্বার্থসাধনতৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিসর্জনরত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। ··· সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, যথার্থ হিসাবে তাঁহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্ফল মুকুলের আবশ্যক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিব্যক্ত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ আত্মা নিষ্ফল।"

সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকই এই রহস্যবাদ, **the philshopoy of this mysterious world** বা এই রহস্যময় পৃথিবীর আত্ম-জিজ্ঞাসা, মর্মবাণী বা মরমিয়া কথা,—সেই আত্মতত্ত্ব বা **mysticism**-এর প্রকাশ তাঁহাদের সুরের ঝঙ্কারে বা তন্ময়তার বাণী-রূপের মাধ্যমে আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। সেই অধ্যাত্ম সাধক, তত্ত্ব-বিজ্ঞানী দার্শনিক ও রহস্যবাদের প্রকাশক বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অমর সাহিত্যে সর্বজীবন ব্যাপিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় আমাদের মরুতৃষা প্রাণতটে নানা ছন্দ, রূপ ও গানে,—কত অপরূপ ভঙ্গিতে, সেই তত্ত্বকথা গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'কে তাঁহার সমস্ত কাব্য ও সাহিত্যের ভূমিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই যে তাঁহার জীবন-প্রভাতেই প্রাণ-নির্ঝরের পার্থিব মায়া-মোহের স্বপ্ন হইতে রবীন্দ্রনাথের অব্যহতি লাভ—ইহা তাঁহার কবি-জীবনের এক আশ্চর্য ঘটনা। এই 'দ্বিজত্ব' বা 'নব-জীবন'-প্রাপ্তিকেও রবীন্দ্রনাথ নানা ভঙ্গিতে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। কবিবর তাঁহার 'ছিন্নপত্রাবলী'তে বলিয়াছেন, "আমাদের

নবজীবন হচ্ছে যখন সুখ ছেড়ে সন্তোষের বৃহৎ-রাজ্যে প্রবেশ করি—বৃথা সন্ধান পরিত্যাগ করে সমস্ত কর্তব্যগুলিকে অকাতরে গ্রহণ করি। সেও একটা বৃহৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করা, আপনার সমস্ত বোঝা এবং পাথেয় স্কন্ধে করে রাজ পথে বেড়িয়ে পড়া।" আর কালান্তরে দ্বিজত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যানে পাই, "...কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই। মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ।"

সূর্য তো প্রতিদিনই উদিত হইতেছে, আবার দিনশেষে পশ্চিমাকাশে অস্ত যাইতেছে। কিন্তু আমাদের কয়টি প্রাণে সেই 'রবির কর' 'নবদিন' বা 'নৌরূজ'-এর বার্তা আনিয়া দিতে পারে? নৌরূজ বা নববর্ষের ব্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিঠিপত্র, প্রবন্ধ বা কবিতা ও গানে নানাভাবেই করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের যেমন নববর্ষ, তেমনি ইরানীয়দের 'নৌরূজ'। এই নৌরূজ যেন বস্তুতঃ 'চিরনূতন' দিনের উৎসব—যার কোন আদি ও অন্ত নাই। মহাকবি ফিরদৌসীর শাহনামায় এই 'নৌরূজ' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তার সকল দিন (চির-) নূতন দিনে রূপান্তর লাভ করুক (হমহ রূজ্‌গারশ্‌ নৌরূজ্‌ বাদ্‌)।" ইহাই বস্তুতঃ সকল পবিত্র আত্মার মর্মবাণী। তখন স্থান ও কালের কোন ভেদ থাকে না। পরম জর্মন মিষ্টিক Meister Fekhart-এর কথায় "And behold, every thing is one Now!"

এই নববর্ষের ব্যাখ্যানে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মানুষের ছোটো আর বড়ো—দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোট সংসার পেতেছে—সেইখানে তার খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙ্গিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে। এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর দু'টি আবর্তন আছে—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘুরছে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায় যে, তার নিজের কোন আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকু

না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। সেইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি। .....এই জন্য ছোট-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করছে নমস্তেহস্তু—বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই।" মিষ্টিক-মনের একই চিন্তাধারা ধ্বনিত হইতেছে আর একজন বিখ্যাত জর্মন ভাবুকের চিত্তে। সেণ্ট্ লুথারের ভাবধারা ব্যাখ্যানে **Egon Friedell** লিখিয়াছেন,

> Sin means only that the creature has turned aside from his perfection, this unchangeable good, and turned to the particular, the changeable and imperfect and above all, to itself. Therefore, if the creature assumes into itself any God as being its own, this constitutes a falling away. "What else did the Devil do, in what else did his falling away or his downfall consist, but in assuming that he too was something and wished to be something, and that something was his own and his due? And what else did Adam do but just this? They say that it was because he ate the apple that he was lost or 'fall'; but I say that it was on account of this assumption of his: this 'I' and 'me' and 'mine' and the like. Had he eaten seven apples, he would not have fallen, but for his assumption." The soul of man has two eyes. One is the gift of looking into eternity, the other that of looking into time and into created beings, and of distinguishing among them. And one single glance into eternity is more pleasing to God than anything that His creatures may achieve merely as creatures. He who achieves that glance will inquire no further: he has found the kingdom of God and everlasting life while still on earth. He has the inward peace of which Christ

spoke, which prevails over all opposition and perversity, aganist oppression, poverty, and shame. He has the quiet which enables him to be joyful in the manner of the Apostles, and indeed of all chosen friends of God and followers of Christ. (Y. C. F. Atkinson, *A Cultural History of the Modern Age*, pp. 141-2).

সেই দিব্যদৃষ্টি বা একক গতিশীল প্রাণ-দৃষ্টির অভাবই সকল সন্দেহ ও দ্বিধা-দৃষ্টি বা জড়-দৃষ্টির কারণ। এই তির্যক বা কাম-দৃষ্টির উল্লেখ করিয়া কী সুন্দরভাবে প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কবি তাঁহার 'মরমিয়া কাব্যে' গাহিয়াছেন !

এই কলুষ পৃথ্বী পরে সুর-অক্ষয় ;
রক্ত-সাগরের পরে দুগ্ধ-ধারা বয়।
অসতর্ক পদক্ষেপ করিলে হেথায়,
মিশ্রণে সে দুগ্ধ তোমার রক্ত বহায়।
কর্‌ল আদম পদক্ষেপ কাম-বশে;
তার বিদায় স্বর্গ হতে সে কাম-দোষে।
সুর-গণ পালায় ছেড়ে তায় দেও বলে,
এক রুটির তরে কত অশ্রু সে ফেলে।
পাপে ধাওয়া তার হলেও কেশের মতন,
কিন্তু সে কেশ বাড়ে চোখের ধন যেমন।
ছিল আদম চক্ষু অক্ষয় জ্যোতির
দৃষ্টি মাঝে কেশ যেন উচ্চগিরির।
যদি আদম করত তখন মন্ত্রণা;
দুঃখে তার কইতে হোত না মার্জনা।
হেতু তার, জ্ঞান যবে জ্ঞানেরে জুড়ে,—
কু-কাজ আর কু-ভাবনে সে বিদরে।
এক রিপু হয় যবে আর রিপুর সহায়,—
অল্প-জ্ঞান হয় তখনে অলস, অসহায়।
নিঃস্বতার ফলে যখন হও নিরাশ;
সৌরবৎ হও ধরে বন্ধু-ছায়া-পাশ।
যাও, ত্বরায় খোঁজরে ভগবান-সখা;
এমনি করিলে ভগবান হয় সখা।
(মস্‌নবী ২, পঙ্‌ক্তি ১৩—২৩)

এখানেও তাই ধ্বনিত হইতেছে উপনিষদের বাণী 'নমস্তেহস্তু'। যতক্ষণ পর্যন্ত না দিব্যজ্ঞান লাভ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ছোট-আমিকে বড়ো-আমি (গুরুদেব বা পীর) এর সাহায্য লইতেই হইবে।

সেই শাশ্বত সত্য বা Eternal Now চির-প্রকাশমান। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের সেই 'নিত্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা'-র অপরূপ রূপটি কয়জন সঠিক অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন! কবিবর রবীন্দ্রনাথ সেই অপরূপের স্বরূপটি তাঁহার জীবন-কৈশোরেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই প্রকাশের আনন্দ নানারূপে তাঁহার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গাহিতেছেন.

আজি এ প্রভাতে কী জানি কেন রে
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ।
জাগিয়া দেখিনু, চারিদিকে মোর
পাষাণ রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ।

কবি জীবন-প্রভাতেই জানিতে পারিয়াছেন যে পার্থিব সঙ্কীর্ণতার মায়া-মোহ-কারাগার প্রকাণ্ড 'আঁধার' হইয়া তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাই তিনি এই 'নব-জীবন-প্রাপ্তি'-র সূচনায়ই ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দৃঢ়-সংকল্প।

ওরে চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর।
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

এই নবজীবনের প্রাণস্পন্দনে তখন হইতেই কবিবর নদীস্রোতের ন্যায় কেবল নবজীবন-বার্তা বহন করিয়াই ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কথায়ই, "তটিনী হইয়া

যাইব বহিয়া—হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া।" সেই-যে তখনকার নবজীবন-উন্মেষণার উত্তেজনাবশতঃ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছেন,

আমি যাব, আমি যাব, কোথায় সে কোন দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান,
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।

এই নবজীবন বা অন্তর্জীবন বলিতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন মনুষ্যত্বের উপলব্ধি। তাঁহার 'চারিত্রপূজা'য় উল্লিখিত হইয়াছে, "মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম-মহল ও খাসমহলের দুই কর্তা—স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলা-ক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।"

এই সাধনারই জের বা প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে জীবন ভরিয়া। এবং এই নবজীবনের পূর্ণরূপটি তিনি তাঁহার কবিকৃতির মাধ্যমে অপরূপভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই প্রায়শ্চিত্ত বা জীবনতপস্যার সূচনাতেই রহিয়াছে তাঁহার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পরেই পাশাপাশি আর চারিটি কবিতা—প্রভাত-উৎসব, অনন্ত-জীবন অনন্ত-মরণ ও পুনর্মিলন। এই কয়টি কবিতাই বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। তাঁহার নবজীবনলাভের আনন্দ যেন পৃথিবীর সকল কিছুতেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই নূতন আনন্দে, "হৃদয় আজি কেমনে গেল খুলি"—তাহা কবিবর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না,—যেখানে "জগৎ আসি করিছে কোলাকুলি"। এই আনন্দের পরিসীমা পার্থিব সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ছেদ করিয়াছে। এখানে—

পুলকে পুরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
এসেছে রবিশশী, এসেছে কোটি তারা,

ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পুরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

বিশ্বচরাচরের সবারই সঙ্গে যে তাঁহার আত্মিক যোগ-সূত্র রহিয়াছে, 'প্রভাত-উৎসবে'ই রবীন্দ্রনাথ তাহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি আমাদের জানাইতেছেন,

নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি রয়েছি ধূলি-'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।

কবিবর এখন 'অনন্ত-জীবনে'-র খবর জানিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার আর কোন ভাবনা নাই।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।

ভগবান যেখানে অসীম ও অনন্ত, তাঁহার সৃষ্ট সব-কিছুই অসীম ও অনন্ত হইতে বাধ্য। আমরা ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সহিত পরিচিত বলিয়াই প্রতি মুহূর্তে আমাদের মরণ ভয়। কিন্তু যিনি অনন্ত জীবনের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার আবার মরণের ভয় কি? —তাঁহার মৃত্যুও যে অনন্তের সহিত যুক্ত। সেই 'অনন্ত-মরণ'—

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

এই সঙ্কীর্ণ 'জীবন'-গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বলিয়াই আমাদের প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়। বস্তুতঃ এই চলমান জগৎ তো চির-পরিবর্তনশীল। ইহা নদীর মত অবিরাম গতিতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছে। যেমন নদীর পরিচয় সাগর-সঙ্গমে, তেমনি প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

জীবনের পরিচয় তাহার মহাপ্রাণের সহিত মিলন। এবং যিনি সেই মহাপ্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ যেন ছোট শিশু—সেই অবুঝ শিশু প্রাজ্ঞ মহাপ্রাণের পরিচয় জানে না বলিয়াই তাহার অহেতুক ভয়। তাই সেই অনন্ত-মরণের উদ্দেশ্যে কবি বলিতেছেন,

যে ডাকিছে ভালোবেসে, তারে চিনিস নে শিশু?
তার কাছে কেন তোর ডর?
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর।
আয়, তারে আলিঙ্গন কর্—
আয়, তার হাতখানি ধর্।

নদীর তরঙ্গের ন্যায় জীবন-মরণের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতি-নিয়তই চলিয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতকে যে জন্ম-মৃত্যুর লীলাখেলা বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে—তাহারই সঠিক 'নবজীবন' লাভ হইয়াছে। তিনিই জীবনের দুঃখ-ব্যথাকেও 'মিলন'-এর অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। এই অহর্নিশ 'পুনর্মিলন' আমাদের বাস্তব জীবনেও সম্ভব। তখনই তিনি বলিতে পারেন,

সবারে বাসিব ভাল, কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভালবাসে যে কেহ।

কিন্তু এই 'মহাপ্রাণ' বস্তুতঃ 'মহাস্বপ্ন'-রই নামান্তর। প্রতিটি জীবন যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় অলীক এবং তাই ক্ষণস্থায়ী, তেমনি আপাতঃ চিরস্থায়ী 'মহাপ্রাণ'-ও 'মহাস্বপ্ন'-তুল্য। কী অপরূপ ভঙ্গিতে কবিবর আমাদের পৌরাণিক মহাদেব শিবকে মহাস্বপ্নের প্রকৃষ্ট রূপ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন! এই সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় সেই মহাদেবেরই নামান্তর মাত্র। কী সুন্দর ভাবে তাঁহার স্বরূপটি 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' নামক কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে!

জগতের মহা-বেদব্যাস
গঠিলা নিখিল-উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশ লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।

এই ক্ষুদ্র জীবন, স্বপ্ন বা ছন্দময় জগৎ যেমন ক্ষণিক, তেমনি সেই আপাতঃ স্থায়ী মহাস্বপ্নও মহাকালের করাল গ্রাসে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু যিনি সেই 'ত্রিনয়ান'-টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই 'মহাস্বপ্ন' চির-ব্যক্ত ও প্রকাশিত। কবির কথায়,

অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগলা মহাধ্যান।

এই ever dynamic ('স্রোতশীল') জগতকে সেই মহাদেবই রূপদান করিয়াছেন; আবার ever static রূপে ধ্যানমগ্ন হইয়া নিজস্ব রূপ আস্বাদনে তিনি পরিতৃপ্ত। এই যখন মানব-জীবনের সারকথা, তখন এই জীবন-স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া ভগবানের উপরই পরম-নির্ভরশীল রবীন্দ্রনাথ প্রেম-মার্গের পথিকরূপে উপনিষদ-উক্ত দুইটি পাখি (দ্বা সুপর্ণা)-র দ্বিতীয় পাখিটির ন্যায় নির্লিপ্তভাবে কেবল সবকিছুই দেখিয়া যাইতে চাহিতেছেন। ইহাই পরিপুষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে 'প্রভাত-সঙ্গীতের'-ই শেষ কয়টি কবিতায়। এই সৌন্দর্য-পিয়াসী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ। তাঁহার সাধ কেবল 'চেয়ে থাকা', অর্থাৎ পরম তৃপ্তির সহিত সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করা। কবি বলিতেছেন,

মনের সাধ যেদিকে চাই
কেবল চেয়ে রব।
দেখিব শুধু দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।
পরানে শুধু জাগিবে প্রেম
নয়নে লাগে ঘোর,
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর।

এবং এই 'প্রকৃতি'-পূজারী কিশোর রবীন্দ্রনাথ নির্লিপ্তভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া পাইয়াছেন,

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীতরব,
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধো আধো বুলি,
চারিদিকে স্নেহ প্রেমরাশি।

'ছবি ও গানে' আমাদের কবি কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যই উপভোগ করিয়া চলিয়াছেন এবং তাহার পরিতৃপ্তির নিদর্শনরূপে 'কড়ি ও কোমলের' ভূমিকাতেই রহিয়াছে.

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এতদিন কবিবর প্রকৃতির সৌন্দর্যই কেবল উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া মানব-হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করিতেছেন—ইহার প্রথম কবিতাটির নামই 'প্রাণ'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানুষের ধর্মে'র পরিশিষ্টে 'মানবসত্য' নামক প্রবন্ধে আমাদের তিনটি জন্মভূমির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—পার্থিবলোক, সৃতিলোক ও আত্মিবলোক। ইহাকে আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলা যাইতে পারে—জড় বা প্রকৃতি জগৎ, পারস্পরিক প্রেমযুক্ত মানবজগৎ ও বিশ্ব প্রেমের প্রতীকরূপে সর্বমানব চিত্তের আবাস-স্থল আত্মজগৎ। তিনটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এবং যাঁহার সেই 'দিব্যদৃষ্টি' আছে, অথবা 'ত্রিনয়ানের' উন্মেষ হইয়াছে তিনি প্রথম হইতেই 'আত্মভোলা'। কাহারো কাহারো এই খাঁটি-প্রেমের স্বরূপটি ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হয়। আবার এরূপও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সারা জীবন 'জড়' জগৎ বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর জীবনের অনুধ্যানেই লিপ্ত থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণ করিয়াছেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে। এই অনুকরণই পরে তাঁহার জীবনে অনুসরণীয় হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব প্রেমধর্মের যে রূপটি তাঁহার পদাবলীতে দেখিয়াছিলেন, তাহারই অনুধ্যান করিয়াছেন তিনি পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে। কবি 'ছিন্নপত্রে'র একস্থানে লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দ ঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্চে—এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"

এই প্রকৃতি-দেবীই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিতাসমূহে 'মানসী' ও 'চিত্রা'-রূপ পরিগ্রহ করে। 'মানসী'-র 'চিরস্মৃতিময়ী' 'ধ্রুবতারকার বেশে' 'অনন্ত প্রেম' 'যুগল প্রেমের স্রোতে'—

নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

—সেই 'দুজনে মিলিয়া ভাসিয়া আসা—যুগল প্রেমের স্রোত' 'সোনার তরী'-তে আসিয়া স্মৃতিলোকের 'মানসসুন্দরী' রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 'সোনার তরী'-র কয়েকটি কবিতাই বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম প্রেমের জয়গান। যে দেহে প্রেমের পরশ লাগিয়াছে, তাহাই তো 'সোনার তরী'। এই সোনার তরী, তাহার 'প্রেয়সী'-কে নিয়াই কেবল ভরপুর থাকিতে চায়।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। এই প্রেমের 'পরশপাথরের' এমনি মহিমা যে সে যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাই 'বৈষ্ণব কবিতা'য় এই প্রেমের স্বরূপটি কবিবর এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,

—এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী—মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা

—এই যে দেবতাকে প্রিয় বা প্রেয়সী ভাবে গ্রহণ করা—ইহাই ক্রমে স্বার্থলেশশূন্য বিশ্বপ্রেমে রূপান্তর লাভ করে। আবার, এই বিশ্বপ্রেমই সঙ্কীর্ণতার আবরণে ধূলিসাৎ হইয়া মানবীয় প্রেমে বা আরো সঙ্কীর্ণতর স্বার্থপূর্ণ পশুপ্রেমে ক্ষণকালের

জন্য আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু এই পরশপাথরের এমনি গুণ যে ইহা সকলকেই তথায় পৌঁছাইয়া দিবেই। তাই কবিবর পরম সন্তোষ-সহকারে বলিতেছেন,

—সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটে পুটে নিতে চায় সব। ...
....
সমুদ্র-বাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে।
বিচার না করিয়া কিছু, আপন রুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।

এই প্রেয়সী 'মানসসুন্দরী' রবীন্দ্রনাথের জন্মজন্মান্তরের সাথী। কবি তাঁহাকে আবার এই পৃথিবীলোকে পাইতে চাহেন। তাই তাঁহার কাতর প্রার্থনা,—

—সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

এই মধুর মুরতি বস্তুতঃ —

আমার অন্তর হইতে লইয়া বাসনা,
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি।

এই যে দুই-এর মিলন—রাধাকৃষ্ণে প্রেমলীলা—বিরহেই ইহার চরম সার্থকতা। কারণ,

—মিলনে আছিল বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।"

একই ভাবধারায় মরমিয়া ফারসী-কবি তাঁহার 'মস্‌নসী'-কাব্যের সূচনাতেই গাহিয়াছেন,

শুনরে কি যে কথা বাঁশী বলে,
বিরহের ব্যথাই যে সে বলে।
ঘর হতে মোরে ছিনে এনেছে যবে,
মোর সুরে কাঁদে স্ত্রী-পুরুষ সবে।
দগ্ধ হিয়া চাইরে বিচ্ছেদ তরে,
প্রেম-ব্যথা যে তবে কইতে পাইরে।
রয়েছে যে তার বঁধু থেকে সরে,
সেই যে খোঁজে বঁধু মিলন তরে।

সেই 'মানসসুন্দরী' তথা রূমীর মূরলী বা বাঁশরী 'চিত্রা'-তে আসিয়া হইয়াছে,

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আবার,

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

সেই 'অন্তরবাসিনী'-র এমনি ক্ষমতা যে সে কবিকে আপন মনের 'সম্রাট' করিয়া দিয়াছে।

—অয়ি মহীয়সী মহারাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান।
....
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।

নিজে 'সম্রাট' হইয়াও, সেই মহিমাময়ী অন্তরবাসিনী 'অন্তর্যামী'-র কথা উপেক্ষা করা কবিবরের উপায় নাই। তাই তিনি বলিতেছেন,

আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ।
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

এই যে অন্তর্যামী 'তুমি'—সে যে শেষপর্যন্ত একক 'আমি'-তে রূপান্তর লাভ করিতে চায়।

যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,
তবে তাই হোক। দেবী অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে—ওগো রূপময়,
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়।

সেই 'এক এবং অদ্বিতীয়' রূপহীন পরম-পুরুষ রূপ পরিগ্রহ করেন প্রকৃতির মাধ্যমে। সেই প্রকৃতিই নানা রূপ ও মাধুর্যের মধ্যে আমাদিগকে নদীর স্রোতের ন্যায় টানিয়া চলিয়াছে। সেই 'প্রকৃতি' বা eternal woman-এর স্বরূপটি ব্যক্ত হইয়াছে 'চিত্রা'-র দুইটি কবিতা—'উর্বশী' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এ। সেই পরম প্রকৃতির দুইটি রূপ—একটি The Beautiful (পরম-সুন্দর) ও অন্যটি The Good (পরম-সৎ)। কবিবর কোন সমসাময়িক পত্রে এই eternal woman-এর দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন,

> পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেকদিন হইতে অনেক কবি কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman (Ewige Weibliche), তাহাকে উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে মাতা নহে, কন্যা নহে, সে রমণী, —সে আমাদের লজ্জা হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়,

সে আমাদিগের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে। ...যে আদিম রহস্য-সমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক, এবং দেবতাদের চিত্ত-বিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দদান করে এবং আমাদের বাসনার চরম তীর্থ স্বর্গ-লোকে বাস করে। আর একটি Woman পৃথিবীতে থাকেন, তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই দুঃখ দেই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারা-ধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখিলে — একভাগে the Beautiful, একভাগে the Good পড়ে। 'উর্বশী' কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই 'অনন্ত-নারী' (Eternal Woman) রূপের দুইটি বৈশিষ্ট্য একই সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে 'বিজয়িনী' কবিতায়। তথায় নাই উর্বশী চরিত্রের সেই মাদকতা, উন্মাদনা। অথবা The good চরিত্রের স্নেহ, দয়া বা মায়া-মমতা। "বিজয়িনীর মধ্যে নারীর আত্মচেতনা যেন আজও কুসুমিত হয় নাই. সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অথচ নিজ পরিপূর্ণ যৌবনশোভা সম্বন্ধে অচেতন; মুগ্ধ করিবার কলা সে জানে না, মুগ্ধ হইবার প্রেরণা সে পায় না। সে যেন জীবন্ত 'প্রস্তরমূর্তি'।" সে সেই—

অনম্বরা অনাসক্তা চির-একাকিনী
আপন সৌন্দর্যধ্যানে দিবসযামিনী
তপস্যামগ্না। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল—
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ অস্ত-অভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসীন। মহাকাল পদতলে
মুগ্ধ নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে রাত্রিদিন বলে
'কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে!
কথা কও মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে।'

তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী
পাষাণে আবদ্ধ ওগো সুন্দরী পাষাণী।

পুরাণ-উক্ত মহাকাল পদতলে অসুর-দলনী, বিজয়িনী, পাষাণী, করালীকালী মূর্তির প্রকৃষ্ট তত্ত্বটি কী সুন্দরভাবে 'প্রস্তরমূর্তি' কবিতায় কয়েকটি কথায় অপরূপ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়া দিলেন!

সেই পরম পুরুষের ইচ্ছাশক্তিই শক্তিরূপিনী মহাকালী-রূপে বারে বারে তাঁহারই প্রকাশ ও বিলয় সাধন করিতেছে। সেই ইচ্ছাশক্তি অন্ধ হইয়াও 'বিকলাঙ্গ' মহাকালের নির্দেশেই কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার শক্তির উৎস আসলে সেই ত্রিনয়ন মহাদেব মহাকাল। রবীন্দ্রনাথ এখন সেই 'মহাকালে'র সন্ধান পাইয়াছেন। তিনিই তাঁহার কাব্যে 'জীবনদেবতা'-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেই জীবনদেবতার আবাহনের পূর্বে কবিবর শক্তিরূপিনী ইচ্ছাশক্তির মাহাত্ম্য কি সুন্দরভাবে 'নারীর দান' কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন,

কী ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি।
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
অন্ধ বালিকা
দেখনি নিজে মোহন কী যে
তোমার মালিকা।

এতদিন আমাদের কবিবরকে নারীরূপিনী অনন্তশক্তি (eternal force) আকর্ষণ করিয়াছে। এখন সেই সৌম্য, ধ্যানমগ্ন পুরুষরূপী 'জীবনদেবতা' তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। একই বস্তু বা তত্ত্ব যাহা ছিল তাঁহার 'প্রেয়সী'—এখন পরিবর্তিত হইয়াছে 'প্রাণেশে'। তাই নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'জীবনদেবতা'-র উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা;
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে—
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সেই জীবনদেবতারই অনুধ্যান করিয়াছেন। 'চৈতালী'-র সূচনায়ই রহিয়াছে,

তুমি যদি বক্ষো মাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরাণ-বল্লভ,
তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবন-তরীতে,—
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

'চৈতালী' ও 'কণিকা'-য় সেই জীবনদেবতারই মর্মকথা উপদেশাকারে সাধারণের বোধগম্যরূপে তাঁহারই 'চৈতালী' বা শেষকথা এবং রস-'কণিকা'-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইতিহাসের তথ্যসকল নূতন রূপ ও অর্থ পাইয়াছে 'কথা' ও 'কাহিনী'-তে। 'কল্পনা'-য় নূতন সৃষ্টি তথা 'অরূপের' ব্যাখ্যানের উদ্যম চলিতেছে। বস্তুতঃ অরূপের আবাহন তখন হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কবি গাহিতেছেন,

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—।

আবার, হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।

অথবা, তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।

এই সকল আপাতঃবিরুদ্ধ গুণ থাকা সত্ত্বেও, সেই পরম-পুরুষ রূপহীন, নির্গুণ 'অরূপ'-কে কবির ভয় নাই। কারণ, তিনি ঠিক জানেন যে,

জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি অমৃত-দুয়ারে।

সেই 'অমৃত-দুয়ারে' দাঁড়াইবার পূর্বে কবিবর এই জীবন-মুহূর্তে 'ক্ষণিকা'-র জয়গান গাহিয়া যাইতেছেন। সেই জয়গান সম্পূর্ণভাবে রূপ নিয়াছে তাঁহার

ভক্ত-হৃদয়ের প্রকাশ রূপে 'নৈবেদ্য'-র থালিতে বা পূজার 'গীতাঞ্জলি'-তে। সঙ্গে সঙ্গে সেই 'অরূপ-রতন'-কে জানিবার জন্য পাপপুণ্যের পারাপারে যাইতে 'বৈতরণী'-র 'খেয়া'-র সাহায্য নিতেছেন। কেবল ভক্তি-মার্গের জলপথে 'খেয়া'-য় পাড়ি দিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, জ্ঞান-মার্গের আকাশপথেও তিনি 'বলাকা'-র সাহায্য নিয়াছেন। অবশেষে সেই 'অরূপ-রতন' বা 'রাজা'-র সন্ধান তাঁহার মিলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে সেই 'অরূপ'-রতন রাজার সঠিক পরিচয় যদি প্রথম হইতেই কেহ পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা হইলেন 'সুরঙ্গমা' ও 'ঠাকুরদা'। 'সুরঙ্গমা' ভক্তি-মার্গের পথিক, 'ঠাকুরদা' জ্ঞান-মার্গের। আর প্রেম-মার্গের পথিক হইলেন 'সুদর্শনা'। সেই 'প্রেমপথ' কঠিন হইলেও, রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন 'রাজা' নাটকে। 'সুরঙ্গমা'-র কাছে 'রাজা'-র পরিচয়ঃ "সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো বলা হবে। .....সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য। যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাইতে চাইতুম না। তারপরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকাল বেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয় এই আমার ঢের—আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।"

জ্ঞানমার্গের পথিক 'ঠাকুরদা' সেই 'রাজা'-র পরিচয় দিতেছেন, "সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! ...আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে। আমরা যা খুসি তাই করি—তবু তাঁর খুসিতেই চরি।" সেই 'ঠাকুরদা' পাপপুণ্য বা ভালমন্দের স্বরূপটি কী সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন!

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ!

এবং রূপ-মুগ্ধ 'সুর্দশনা' নাটক-শেষে রূপের আবিলতা হইতে মুক্তি পাইয়া 'অরূপের' প্রকাশ 'রাজা'-র পরিচয় দিতেছেন, "তুমি সুন্দর নও, প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম। তোমার যদি কোন উপমা থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছু নয় সে তোমার।"

সেই যে একক 'তুমি' বা ভারতীয় ঋষিদের অধ্যাত্মবাণী 'তত্ত্বমসি'—তাহারই বিবৃতি রহিয়াছে কবীন্দ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি গ্রন্থে গ্রন্থে, বিশেষ করিয়া তাঁহার শেষ জীবনের কাব্যসমূহে। সেই তত্ত্ব বস্তুতঃ কোন বিশেষ দেশ বা কালের নহে—ইহা সর্বদেশ ও কালের বাণী। এই একই চিন্তাধারা সর্বকালের সাধক, সন্ত (Saint) বা সুফী-কবিগণ দেশে দেশে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে এই রহস্যের উদ্ঘাটন কোন কাব্য-বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে সঠিক সম্ভব নহে। এই গূঢ় রহস্যের মাধুরী তাঁহাদের কাব্য বা বাণীর মধ্যেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া থাকে। এই মাধুরীকে তথা হইতে ছিনাইয়া আনা সেই গূঢ় রহস্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বময় কাব্য-রসেরই অপযশ করা মাত্র।